গদ্যসংগ্রহ : অমলেন্দু চক্রবর্তী

সমালোচনার বদলে

শুচিব্রত সেন

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'গদ্য সংগ্রহ' (দে'জ পাবলিশিং)। সংকলনে অমলেন্দুর-ই সুযোগ্য পুত্র প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী। ভূমিকা লিখেছেন উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষজ্ঞ অলোক রায়। যে অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে প্রিয়দর্শী অধুনালুপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলি সংকলিত করেছেন, তার জন্য প্রাথমিক ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। শুধু ধন্যবাদে তার এই কাজের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। বস্তুতপক্ষে এ ব্যতীত বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজ বঞ্চিত থেকে যেত অমলেন্দু চক্রবর্তীর লিখন শৈলীর এক নূতন মাত্রা থেকে।

উপন্যাসিক ও গল্পকার অমলেন্দু পাঠক সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই সুপরিচিত। 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন', 'যাবজ্জীবন', 'রাধিকাসুন্দরী', 'আকালের সন্ধানে' প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে পাঠক অনুভব করেন একাত্মতা। বেশ কয়েকটি পুরস্কারে ভূষিত তাঁর কিছু গ্রন্থ। কিন্তু পুরস্কারটা বড় কথা নয়। সমাজ সচেতনতার সঙ্গে সাহিত্যিক শৈলীর নিবিড় যোগে সেগুলি উদ্ভাসিত স্বমহিমায়। কিন্তু তাঁর গদ্য সংগ্রহ পাঠ করতে করতে পাঠক হিসাবে আমাদের কাছে উন্মোচিত হয় অনুভব ও চিন্তার গভীরতার এক নূতন জগৎ।

বিষয়-বৈচিত্র্যে, যুক্তির পারম্পর্যে, উপলব্ধির গভীরতায়, চিন্তনের মৌলিকত্বে এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে এই সংকলনকে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। উপরন্তু, বহু পূর্বে লিখিত হলেও এর প্রাসঙ্গিকতাও অনস্বীকার্য। যে কোন বিবেকবান প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীই চান আত্মপ্রকাশের এক মাধ্যম। অমলেন্দু বেছে নিয়েছিলেন লেখাকে। তাঁর নিজের কথায়, "ভারমুক্ত হতে চাই আত্ম-উন্মোচনে।" (পৃ-৩২) শুধু ভারমুক্ত হওয়াটাই অবশ্য তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না। "কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্বপালনে যে কোন রকম ফাঁকিই তো শেষ পর্যন্ত এক ধরনের আত্মদ্রোহিতা।" এই সাহিত্যিক ইতিহাসের এক সত্য তত্ত্বকে টেনে এনে তাই বলতে পারেন, "যাঁদেরকে নিয়ে ইতিহাস রচনা, তাঁদের সঙ্গে কিছুমাত্র আত্মিক সংযোগ তৈরি না করে কি কোন ইতিহাসবিদ লিখতে পারেন মানুষের ইতিহাস?"(৩৯) পাঠক স্মরণ করতে পারেন ঐতিহাসিক ই এইচ কারের এই উক্তিটি, "History cannot be written unless the historian can achieve some kind of contact with the mind of those about whom he is writing." (*What is History?*) এর পরেই অমলেন্দু বলেন, "অথচ একজন কবি বা উপন্যাসিককে প্রতিদিনের জীবনচর্চায় খুঁজতে হয় মানুষের মুখ। সহস্রের জনতায় নিত্যসন্তরণে ইতিহাসের উজানেই ভাসতে হয় তাকে।" অমলেন্দুর বক্তব্যে তাই কোথাও যেন এসে মিলে যায় ইতিহাসের জনতা ও সাহিত্যের সম্পাদ্য।

সংকলক সচেতনভাবেই গ্রন্থটিকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। বিষয়ভিত্তির সঙ্গে কালানুক্রমের একটি সঙ্গতিও তিনি মেনে চলেছেন। সবকটির আলোচনা স্থানাভাবে সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি নক্ষত্র-উজ্জ্বল উদাহরণে চেষ্টা করব দেখাতে অমলেন্দুর বোধের গভীরতা ও তার তাৎপর্য। কল্লোল যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বলেছেন, তাঁদের সাহিত্যে চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা ও ধর্মগ্রন্থ রচনার অবনমনের বিষয়টি। (পৃ-৫২) প্রশ্ন উঠতে পারে, চলচ্চিত্র ইত্যাদি কি সমাজে অপাংক্তেয় কোন বস্তু? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কল্লোলের লেখকবৃন্দ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন তার একটা পরিণতির দিগ্-নির্দেশ দেবেন, তা যে হয় নি তা আমরা সবাই জানি। আর তাই উত্তরকাল কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত। তাঁর এই নির্মোহ সমালোচনা প্রাসঙ্গিকতার এক উদাহরণ। গল্পগুচ্ছ আলোচনা করতে গিয়ে লেখকের পর্যবেক্ষণ, "গল্পগুচ্ছের সঞ্চরমান নরনারীর পদধ্বনি রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অশ্রুত।" (পৃ-৫৫) কিংবা "প্রতি যুগের আধুনিকতা তার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।" (পৃ-৫৩) এর পরেও রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "আধুনিক ছোট গল্প (ত্রিশের যুগ থেকে) নানাভাবে নানাপথে বাঁকে ঘোরার পরও 'গল্পগুচ্ছ' তার পাঠক হারায়নি। এই পাঠক আমাদের লেখকরা ক'জন পেয়েছেন?" ভারী ভারী রবীন্দ্র গবেষণার পাশে এই ছোট প্রবন্ধটি গল্পগুচ্ছের এক জায়মান নির্দেশক।

'বাংলা ছোটগল্প : সাম্প্রতিক ঝোঁক'— অমলেন্দুর আরেকটি লেখায় আমরা খুঁজে পাই এক নির্মম ভাষণ। নগর-বিলাসী মধ্যবিত্ত লেখকরা হয়ে উঠছিলেন "নিজেদের বিবরে নিজেরাই শৃঙ্খলিত।" (পৃ-৬৯) বিচ্ছিন্নতা প্রবল হচ্ছিল, অথচ আক্রোশ ছিল, তাই জীবনবিরোধী সাহিত্যকর্মে ঘটে গেল আত্ম-সমর্পণ। এই প্রবন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান একটি উক্তি করেছেন অমলেন্দু— "সৃজনশীল যুগই জন্ম দিতে পারে সৃজনশীল শিল্পীর" (পৃ-৬৬)। কিন্তু মহৎ সৃষ্টি তা-ই যা যুগতিক্রমনীয়, আর এখানেই হেরে গেলেন, ব্যতিক্রম বাদে, '৬০-৭০ এর অধিকাংশ ছোটগল্পকাররা। বিদ্যুৎ চমকের মত একটি বক্তব্যে কী আশ্চর্যভাবে ধরা পড়ে আজকের, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর এই দশকের শিল্পী সাহিত্যিকদের নগ্ন চরিত্রের অতিলোভাতুর জিহ্বা। "আজ বিস্ময় জাগে, প্রতিষ্ঠান কি সত্যি অবতার? হরধনুও অবলীলায় ভাঙে" (পৃ-৭১)। কল্লোল থেকে শুরু করে

'৬০-৭০ দশক পার হয়ে সাহিত্যিকের এই অনিবার্যতাই কি ইতিহাসের নিষ্ঠুর অনিবার্যতা?

'বাঙালিয়ানার মাপ' প্রবন্ধে পাঠক লক্ষ্য করবেন ভাষার এক ওজনদার পরিক্রমা। বক্তব্য যেন স্বাচ্ছন্দ্য ও তীব্রতার মেলবন্ধনে শুধু স্বাদু গদ্যের পরিচয় নয়, মাঝে মাঝে কাব্যিক এক ঝলকে মনকে প্রসন্নতায় ভরে দেয়।

"স্কাইস্ক্র্যাপারের ধারণা/ অতি সাম্প্রতিক নাগরিক বিত্তগরিমা।/ কিন্তু হাজার বছরের অনুক্রমণিকায়/এই মেটে ঘরটুকুই বাংলার চিরন্তনী।" (পৃ-৮৩) *(পংক্তি গঠন বর্তমান নিবন্ধকারের)*

কিংবা, "নীলার দু-ফোঁটা চোখের জলের লোনা স্বাদই/এক বুক সমুদ্রের ব্যাপ্তি পেয়ে যায়।"

'গদ্যে সংগ্রহ'র পঞ্চম পর্বটি নিবেদিত হয়েছে নাটক ও নাট্য সাহিত্য প্রসঙ্গে। উৎপল দত্ত নির্দেশিত 'ফেরারী ফৌজ' থেকে সুদূর বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ প্রযোজিত বিভিন্ন নাটক। স্বাভাবিক ভাবেই বাদ পড়ে নি নান্দীকার বহুরূপীর মত বিখ্যাত নাট্যসংস্থা। কিন্তু একই সাথে উপেক্ষিত হয়নি কার্জন পার্ক থিয়েটারের সিল্যুএট, শতাব্দী এবং অবশ্যই বাদল সরকারের নাট্য পরিকল্পনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি। ১৯৯-২৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠক পেয়ে যাবেন '৬০-৭০ এর দশকের নাট্য আন্দোলনের এক সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক নাট্য আলোচনা। সাধারণ পাঠকের বাইরেও, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য সাহিত্য যাদের পাঠ্য বিষয়, তারাও উদ্বোধিত হবেন এক নূতন উচ্চারণে যা কিনা নোটসর্বস্ব বাজারি সমালোচনার বৃত্তের বাইরে। সামগ্রিকভাবে যুগটাকে ধরে নিয়ে তারই পশ্চাৎপটে আলোচিত এই নাটকগুলি। উঠে এসেছে প্রসেনিয়াম মঞ্চ। মুক্তমঞ্চ এবং মঞ্চবিহীনতার কথায়ও উঠে এসেছে কয়েকটি মণিমুক্তা। যথা, "কিন্তু কোথাও যেন 'রক্তকরবী'র সময়কার প্রয়োজনগুলির সেই ঐশ্বর্যময় বিরাটত্ব আর দানা বেঁধে উঠছে না। গভীরভাবে কথা বলার যে অঙ্গীকার ছিল সৎনাট্যের বা নবনাট্যের, আস্তে আস্তে সে প্রয়াসগুলি এসে নিবিড় হয়ে উঠছে আত্মগত বিষয়ে।" (পৃ-২১৭) সত্যিই তো। যে প্রতিশ্রুতির দায়বদ্ধতা নিয়ে শুরু হয়েছিল এই নাট্য-আন্দোলন, সেখান থেকে সরে এসে তা হয়ে উঠল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, নাট্য সংস্থাগুলির ভিতরকার বেশ কিছু কুৎসিত কলহ আমাদের ব্যথিত করেছিল। উপরন্তু অমলেন্দুর উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিদেশি নাটকের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায়। দেশজ মাটি অনেকটা বঞ্চিত হয়ে থাকল। আবার বিপ্রতীপের প্রশংসাতেও তিনি অকুণ্ঠ। "'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' শুধু কাব্য নয়, জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে সংপৃক্ত বিশ্ব-সংকটের নতুন নাট্যগঠন।" (পৃ-২১৮) অথবা "কেননা, বহুরূপীর বাঁচা তো আমাদের অনেকেরই বাঁচা" (পৃ-২২৫)। একটা সময় পর্যন্ত তো একথাগুলি সত্যই ছিল। আজকের পদলেহী আত্মসম্মান বিসর্জনকারী দলদাস নাট্যব্যক্তিত্বদের কার্যাবলির জন্য সেদিনের সত্যটা মিথ্যা হয়ে যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে'। নামকরণেই ইঙ্গিত মেলে এ আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা সাবজেক্টিভ অথবা আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। কিন্তু এর তাৎপর্য তো নিহিত অন্যত্র। আজকে অনেকটাই অবহেলিত, কিন্তু এক সময়কার উজ্জ্বল নক্ষত্রদের পুনরবলোকন ইতিহাসেরই দাবি। মানুষ তো বৈচিত্রে ভরা, তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদ্যকার দেখেছেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে। কোথাও তা ব্যক্তিমানস, কোথাও বা তা মতাদর্শের দৃঢ়তা। অথবা সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য, এই দুই ভট্টাচার্যের বিপ্রতীপ।

সংকলক-এর পরের অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন 'বিবিধ প্রসঙ্গে'। এর মধ্যে 'শিক্ষা-সংকট : শিক্ষকের ভাবনা' লিখিত ১৯৭১-এ। আজ ২০১৪-য় এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। লিখেছিলেন, "যে স্কুলের যত বেশি মাইনে তত ভালো স্কুল।" সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'রামধনু' চলচ্চিত্র তো এই বক্তব্যেরই ছবি। কিংবা "দেশের সামগ্রিক ল-অ্যান্ড-অর্ডার সমস্যার মতোই অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই আজ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা।" (পৃ-২৯৫) আজকের (২০১৪) পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক কী বলেন? তবে অমলেন্দুর সময় থেকে একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে। শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি হয়েছে আশাতীতভাবে। এর ফল হয়েছে অবশ্য বিপরীত। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষক আন্দোলনের ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে। সত্য একটাই, আর তা হল 'সংকট গভীরে' (পৃ-৩০০)। 'নির্মাণে সংকল্প চাই' প্রবন্ধটিতে সংকলকের অজান্তেই বোধ হয় পূর্ববর্তী প্রবন্ধ 'নতুন বোধোদয়' এর পুনরুক্তি ঘটেছে। (পৃ-৩০৭) এক অন্য মাত্রার, সঙ্গে নাট্যরূপ সহ প্রবন্ধ 'আষাঢ়ের সাতকাহন" সাধারণ কথা থেকে গভীরতর চিন্তার দ্যোতনায় বোধের জগৎ নূতন করে উন্মোচিত হয়। মিডিয়ার দাপটের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গদ্যকার লিখছেন, "এতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার ফলে আজকের ছেলেমেয়েরা সেনস অফ সাইলেন্স ভুলে যাচ্ছে।" রচনাকাল ১৯৯৪। এরিখ হবসবম তাঁর শেষ বই Fractutred Times (২০১৩) এ জানাচ্ছেন, "The consumer society seems to consider silence a crime." (পৃ-১৪)। কী বলবেন? Great men think alike?

শেষ পর্যায় অর্থাৎ 'ঋষ্যশৃঙ্গ'-কলমের লেখাগুলিও বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় ভরপুর। আসলে অমলেন্দু চক্রবর্তী যে বিশ্বাসের গভীরতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রেরণা থেকে লেখাগুলি রচনা করেছেন, তার চিরপ্রবহমানতা অনস্বীকার্য। লেখক তাঁর লেখা ও জীবনচর্চাকে একসাথে মিলিয়েছেন। এ দুঃসময়ে সে বড় কঠিন কাজ। গনগনে সমাজ সচেতনতার সঙ্গে ভাষার ঋজুতা ও শৈল্পিক সততায় এই গদ্যসংগ্রহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মোড় ফেরানোর এক দিগ্‌চিহ্ন হিসাবে হয়ে থাকবে চিরভাস্বর।